COLLEGE LIBRARY · MALIGAON, GUWAHATI-11 · L.C. BARUAH

প্রতিধ্বনি

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী
২০১০

"প্ৰতিধ্বনি"
বাংলা বিভাগীয় পত্ৰিকা
ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়
মালিগাঁও, গুয়াহাটী - ৭৮১০১১

সপ্তম প্ৰকাশ ঃ

জুন - ২০১০

ডি.টি.পি ঃ বিশ্বজিৎ দাস
বন্দনা এন্টাৰপ্ৰাইজ
মালিগাঁও চাৰিআলি, গুয়াহাটী - ১২
কুমুদ কলিতা
ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়

ছাপা ঃ
বন্দনা এন্টাৰপ্ৰাইজ
মালিগাঁও চাৰিআলি, গুয়াহাটী - ১২
দূৰভাষ ঃ ৯৮৬৪২-৬৩১৯০

Office of the Principal
LALIT CHANDRA BHARALI COLLEGE
Maligaon, Guwahati-781011, Assam (India)
Ph : +91 361 2570465, 2675259, Fax : +91 361 2570465

Dr. N.K. Deka, M.Sc., Ph.D.
Principal & Secretary

L.C. BHARALI COLLEGE LIBRARY MALIGAON, GUWAHATI-11
Date .....

Ref. ..... Date .....

শুভেচ্ছা বাণী

ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়ৰ বাংলা বিভাগৰ মুখপত্ৰ 'প্ৰতিধ্বনি'লৈ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। মুখপত্ৰখনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকলৰ বৌদ্ধিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত অৰিহণা যোগাব বুলি আশা কৰিছোঁ। প্ৰতিধ্বনিৰ উত্তৰোত্তৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰিলোঁ।

ড° নিশিকান্ত ডেকা

অধ্যক্ষ

ললিত চন্দ্ৰ ভৰালী মহাবিদ্যালয়

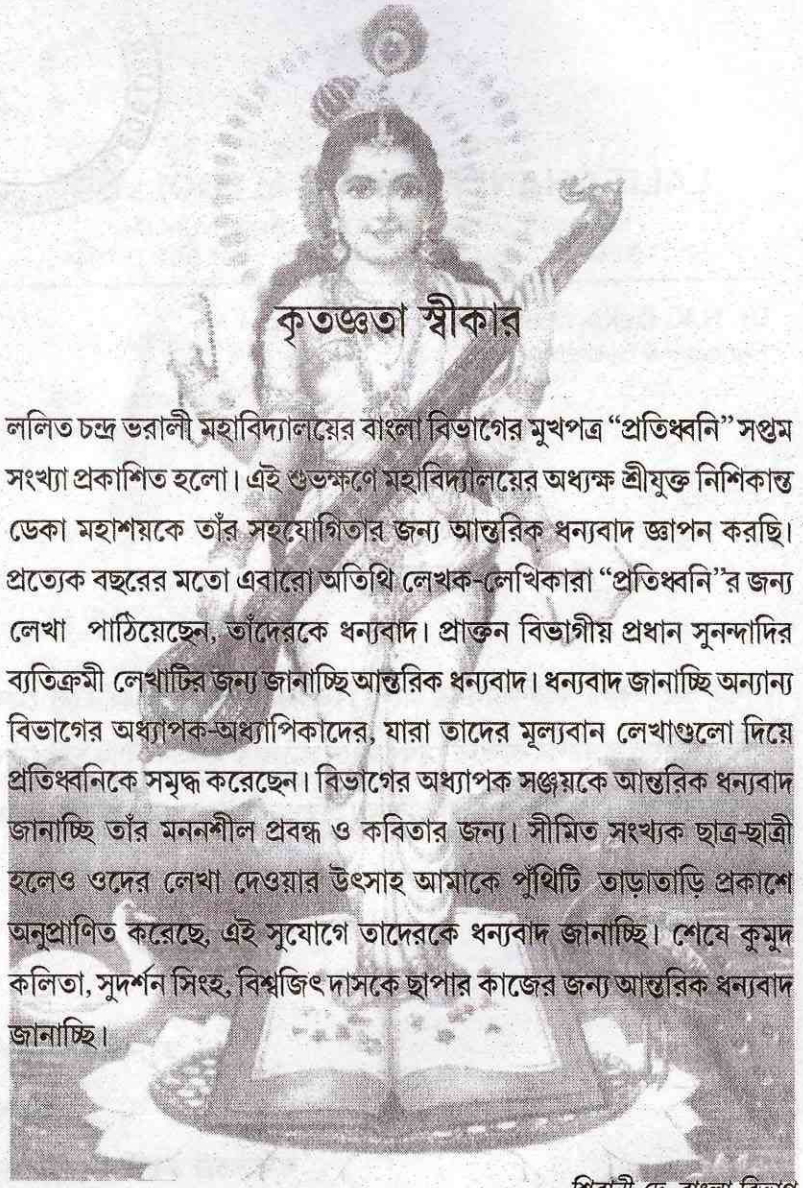

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের মুখপত্র "প্রতিধ্বনি" সপ্তম সংখ্যা প্রকাশিত হলো। এই শুভক্ষণে মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত ডেকা মহাশয়কে তাঁর সহযোগিতার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি। প্রত্যেক বছরের মতো এবারো অতিথি লেখক-লেখিকারা "প্রতিধ্বনি"র জন্য লেখা পাঠিয়েছেন, তাঁদেরকে ধন্যবাদ। প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান সুনন্দাদির ব্যতিক্রমী লেখাটির জন্য জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ। ধন্যবাদ জানাচ্ছি অন্যান্য বিভাগের অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের, যারা তাদের মূল্যবান লেখাগুলো দিয়ে প্রতিধ্বনিকে সমৃদ্ধ করেছেন। বিভাগের অধ্যাপক সঞ্জয়কে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁর মননশীল প্রবন্ধ ও কবিতার জন্য। সীমিত সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী হলেও ওদের লেখা দেওয়ার উৎসাহ আমাকে পুঁথিটি তাড়াতাড়ি প্রকাশে অনুপ্রাণিত করেছে, এই সুযোগে তাদেরকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শেষে কুমুদ কলিতা, সুদর্শন সিংহ, বিশ্বজিৎ দাসকে ছাপার কাজের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

শিবানী দে, বাংলা বিভাগ

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়

সম্পাদকীয়...

BHARALI COLLEGE LIBRARY
Date.....

.....আবার "প্রতিধ্বনি" প্রকাশের সময় হয়ে গেল। একদিকে রবীন্দ্রপক্ষে রবীন্দ্রনাথের সার্ধশতবর্ষের দেশব্যাপী, থুড়ি বিশ্বব্যাপী উদ্‌যাপন, অন্যদিকে বাঙালীর জন্য আরো এক সুখবর, বাংলা ভাষা পৃথিবীর মধুরতম ভাষা বলে রাষ্ট্রসংঘের স্বীকৃতি লাভ। সত্যিই তো —

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি, বাংলা ভাষা"

সাহিত্য হচ্ছে সমাজ জীবনের প্রতিচ্ছবি এবং সাহিত্যের মধ্যেই রয়েছে আদর্শ সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার প্রতিধ্বনি। "প্রতিধ্বনি"র প্রতিটি সুরের প্রতিধ্বনিতে অনুরণিত হওক সুস্থ সমাজ গড়ে তোলার আকাংখা। ক্ষুদ্র এই পত্রিকাটির দ্বারা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্য চর্চার সুযোগ করে দেওয়া হয়। ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার প্রতি আগ্রহকে বাড়িয়ে তোলা এবং তাদের প্রতিভা উন্মেষের সুযোগ করে দেওয়াই এই পত্রিকাটির প্রকাশের প্রধান লক্ষ্য। "প্রতিধ্বনি", বাংলা বিভাগ, মহাবিদ্যালয়ের প্রতি দায়িত্ব পালন করার এক প্রতিশ্রুতি। ইতি -

শিবানী দে, বাংলা বিভাগ

ললিত চন্দ্র ভরালী মহাবিদ্যালয়

ঃ সূচীপত্র ঃ

			পৃষ্ঠা
	পদ্য		
১)	রবীন্দ্রনাথ	*নীলিমা গোস্বামী শর্মা*	১
২)	বৃষ্টি আসে	*রত্নেশ্বর মিলি*	২
৩)	বিষাক্ত বাতাস	*ঝুমা রায়চৌধুরী*	৩
৪)	ধ্বংসের ছবি	*হীরাবালা দাস*	৩
৫)	অনুপ্রাসের কবিতা	*মৃণাল কান্তি সিংহ*	৪
৬)	মায়ের ভালোবাসা	*রুমকী দাস*	৪
৭)	নতুনকে আহ্বান	*পাপড়ি দে*	৪
৮)	আমাদের বাড়ির পাশে একটা অরণ্য হোক	*সঞ্জয়চন্দ্র দাস*	৫
৯)	স্মৃতি	*পাপড়ি দে*	৬
১০)	তুমি	*মানসী ঘোষ*	৭
	গদ্য		
১১)	ব্যতিক্রমী সূর্যোদয়	*ডঃ সুনন্দা দাস*	৮
১২)	বর্তমান সংস্কৃতির সংকট	*রঞ্জনা সেন*	১২
১৩)	জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা ঃ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্য	*সঞ্জয়চন্দ্র দাস*	১৪
১৪)	মাতৃ -তর্পণ	*মলিনা চৌধুরী*	১৮
১৫)	আকাশ কুসুম	*শিবানী দে*	২১

Date .....

রবীন্দ্রনাথ

(সার্ধশতবর্ষে রবীন্দ্র প্রণাম)

নীলিমা গোস্বামী শর্মা
অসমীয়া বিভাগ

রবীন্দ্রনাথ
তুমি কোথায় নেই...

রেলে
নৌকায়
পথে
সবখানে কেবল তুমি...

আত্মার সংগে
আত্মার মিলনের ধ্বনি
আমি
তোমার কবিতাই শুনি

মানুষের জন্য
মানুষের আদর
আমি
তোমার কবিতাই পড়ি

আমি জানি
অলংঘ্য প্রাচীর নেই
মানুষের
মানুষের কাছে

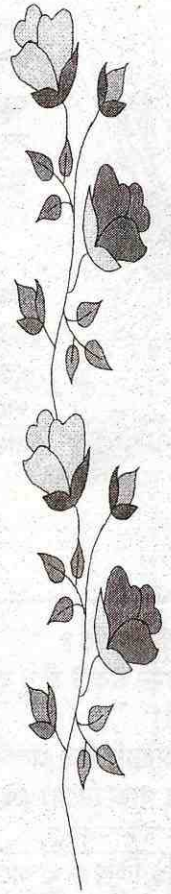

যতটুকু
তোমার কবিতায়
রয়েছে

পথচারী
মাঝি
ভিখারী
অপেক্ষারত প্রেমিক
সবার মুখেই
গুণগুণ গুণগুণ
কবিতা তোমার

রবীন্দ্রনাথ
আমি তোমাকে জানি
তুমি যে
মানুষের কবি

কেবল হৃদয়ের
এক অনুভূতি নয়
শতিকা থেকে শতিকা...

হৃদয়
আমার অপূর্ণ
তাই নাকি
পূর্ণতার এই যাত্রা
তোমারই পথে...

বৃষ্টি আসে

মূল ঃ রত্নেশ্বর মিলি
অসমীয়া বিভাগ
অনুবাদ ঃ শিবানী দে
বাংলা বিভাগ

বৃষ্টি আসে.....
মেঘের বুক থেকে ঝরঝরিয়ে
গরজায়
চমকায় বিদ্যুৎ
আসে বৃষ্টি
ভেজাতে আমার শরীর

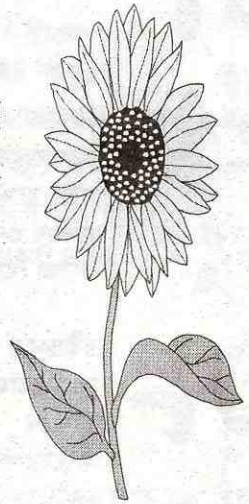

বৃষ্টি আসে .....
কখনও কনকনিয়ে
কখনও ঝুমঝুমিয়ে
কখনও আবার
শিলা হয়ে আসে
হানে আমার বুকে

বৃষ্টি আসে.....
ধারাসারে মুশলধারে
বৃষ্টির অসংখ্য ফোঁটায়
আমি ভিজে যাই
সর্বস্ব মানুষটাই ডুবে যাই
বৃষ্টির সাগরে

ভালো লাগে.....
ভালো লাগে বৃষ্টিতে ভিজে
তোমার কথা মনে আসে
গালে মুখে লাগে বৃষ্টি মেশা
বাতাসের ছাট।

শিক্ষক ঃ বলতো ব্যাক্টেরিয়া কি ?
ছাত্র ঃ ব্যাক্টেরিয়া এমন একটি জীব যা খালি চোখে দেখা যায়না।
শিক্ষক ঃ একটি ব্যাক্টেরিয়ার চিত্র অংকণ করে দেখাও,
ছাত্র ঃ (একটু পরে খাতা নিয়ে) এই যে স্যার.....
শিক্ষক ঃ একী, এ যে সাদা কাগজ,
ছাত্র ঃ স্যার, একেছি, কিন্তু দেখা যাচ্ছেনা, কারণ ব্যাক্টেরিয়া খালি চোখে দেখা যায়না।

সংগ্রাহক ঃ মন্টি দাস, স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

বিষাক্ত বাতাস

ঝুমা রায়চৌধুরী
অতিথি লেখিকা

বাতাসে আজ বিষাক্ত বারুদের গন্ধ
নিশ্বাসে বিষ মেশে,
বিশ্বাসহীনতার, আস্থাহীনতার দিনগুলি
যায়, বয়ে যায়।
বুকে চাপা ব্যাথা অনুভূত হয়
যন্ত্রণা - সে তো আজ নিত্যসঙ্গী
বাঁচা বড় কঠিন, মৃত্যুই বেশী সহজ।
সাবলীল ভাবে এসে দাঁড়ায়
জীবনের মুখোমুখি।
ব্যস্ত নগরীর দিন, ভুলে যায় সব
মানুষের আর্তনাদ চাপা পড়ে যায়
গাড়ীর হর্ন আর পথচারীর কোলাহলে।
নিভৃত গহনে বসে বিলাপ করে যারা
প্রিয়জন হারানোর শোক কি ভোলা যায় ?
এত সহজ নয়।
শরীরের ক্ষত শুকায়
দগ্ধ-ছিন্ন-আঁচড় কাটা আত্মা মন
জীবনের ভার বহন করা দায় -
তবু বাঁচতে হয়, বেঁচে থাকি আমরা
যতদিন না কাল আসে, হায়।

ooo

ধ্বংসের ছবি

হীরাবালা দাস
হিন্দী বিভাগ

চারদিক কেমন থমথমে,
মানুষ গুলো ভয়ার্ত
কারণ কয়েক মুহূর্ত আগে
ঝলকেছিলো আলো,
সঙ্গে ভয়ানক শব্দ,
এখন সেখানে
মানুষের জলন্ত শরীর

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত আগে
তুমুল শব্দ নিয়ে
ঝলকেছিল আলো,
এক মুহূর্তে শেষ হয়ে গেলো
কত জীবনের আশা
কত রঙীন স্বপ্ন।

হে মানব, তুমি যদি জীবশ্রেষ্ঠ
তাহলে এ কার কাজ ?
কেন সৃষ্টিকর্তা
তোমাকে সবকিছু দিয়েও
রাখলো অজ্ঞানী করে ?
জানিনা, এই ধ্বংস হয়তো,
কোনো এক নতুন সৃষ্টির সংকেত
যেখানে থাকবেনা কোন
হিংসা, ভয় আর পাপ.....

ooo

পুত্র ঃ মা, স্বাধীনতা দিবস কখন হয় ?
মা ঃ যখন তোমার বাবা বাড়ীতে থাকেনা।

অনুপ্রাসের কবিতা

মৃণাল কান্তি সিংহ
অতিথি লেখক

(১)

মিলিছে মনোরঞ্জনে মহামায়ার মহোৎসবে
মাগিছে মিনতিতে মনের মনফুলে
মৃণালের মুকুলে মনোজ মন্দিরে।

(২)

বহিছে বসন্তের বাতাস
বিকশিত বনে বিকাশ
বনশ্রীর বনফুলে বনমালি
বাসবকে বর্ণিতে বর্ণালি।

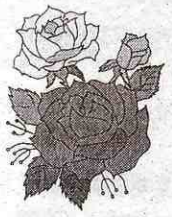

নতুনকে আহ্বান

পাপড়ি দে
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

ঝর ঝর ঝর ঝরছে বৃষ্টি...
নতুন নতুন প্রাণের সৃষ্টি,
সবুজ গাছের সবুজ ডালে,
নিত্য নতুন জীবন দোলে।
সুগন্ধে ভরা আকাশ বাতাস,
জাগায় মনে আনন্দ উচ্ছ্বাস।

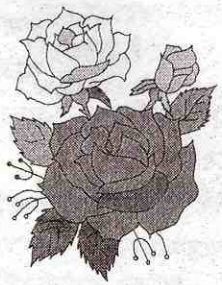

মায়ের ভালোবাসা

রুমকী দাস
স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

মায়ের প্রাণের ভালোবাসা
রোজ আমি পাই,
মায়ের কোল ঘেষে বসে
রোজ খাবার খাই,
মায়ের হাতের স্নিগ্ধ পরশ
আর কোথাও নাই।

ছোট বেলা দুষ্টমিতে
বুঝতে পারিনি তাকে,
আস্তে আস্তে বড় হয়ে
বুঝতে পারি মাকে।
মা-ই জগতের আলো
মা গো মা-
তুমি কেন এত্তো ভালো!

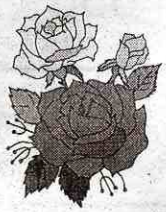

আমাদের বাড়ির পাশে একটা অরণ্য হোক

সঞ্জয়চন্দ্র দাস
বাংলা বিভাগ

আমাদের বাড়ির পাশে একটা অরণ্য হোক
পৃথিবীর অসংখ্য কোলাহলের ঘোলা জল থেকে
উঠে এসেছে মর্মাহত এই উক্তি।
উদোম চোখের সামনে চন্দ্রবিন্দু এঁকে দিয়ে
মুখ লুকোয় কত প্রজাতি— যেন চিলতে চাঁদ
নীলজলে ডুব দিয়ে বানভাসি অরণ্য...

আহত সময় স্রোতে তবু স্বপ্ন দেখে—
শহরের বড় রাস্তাধরে প্রতিরাত হেঁটে যায়
বাঘ-হরিণ-বন্যমহিষ-সোনালি বাঁদর,
ইটের ক্যানভাসে ছড়ায় অর্কিড, সর্পগন্ধা, চন্দন—
নোংরা নদীর জলে ভাসে লিলিফুল—
পাতায় পাতায় জাগে সবুজ— বর্ষার ভোর।

তারপর, আহত সময়ে স্বপ্ন ভাঙতেই
হাজার বিদ্যুতের ঢেউ হৃদয়কে করে দেয় ম্লান,
ইচ্ছে ছিল একবুক শ্বাস নিয়ে রাতের পাতার ফাঁকে
চোখ টেপা চাঁদের গাঁয়ে চুমো ছড়িয়ে দেওয়ার—
তাই, আর্তকণ্ঠে ভেসে এলো এক প্রার্থনা—
আমাদের বাড়ির পাশে একটা অরণ্য হোক।

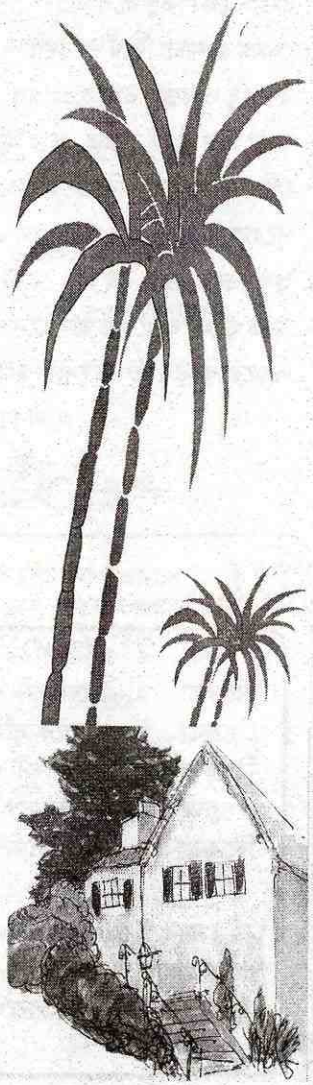

স্মৃতি

পাপড়ি দে
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

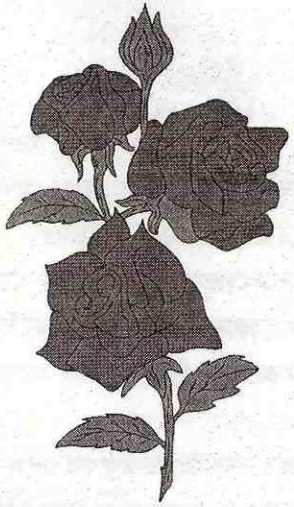

আকাশ যেন ডাকছে আমায়,
বাতাস যেন কিছু বলে যায়,
খোলা জানালা দিয়ে তাকিয়ে,
মন শুধু ভাবছে তোমায়...
ভাঙা মনে আমি রয়েছি তার আশাতে,
রঙীন স্বপ্নের রঙে নিজেকে রাঙাতে
পুরোনো দিনের ছবি গুলো মন এঁকে যায়
শুধু ভেবে ভেবে এই দিন কেঁটে যায়
স্মৃতি গুলো কখনোও যদি মনে পড়ে যায়
পারবে কি ভুলতে কখনোও আমায় ?

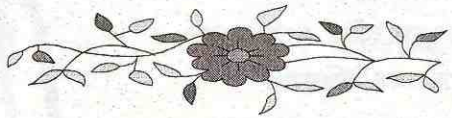

ক্রেতা ঃ একটি সুতির শাড়ী দেখান,
বিক্রেতা ঃ ঐ বেনারসী শাড়ী আন,
ক্রেতা ঃ আমাকে সুতির শাড়ী দেখান,
বিক্রেতা ঃ ঐ বেনারসী শাড়ী আন,
ক্রেতা ঃ (একটু রেগে) কি মশাই, তখন থেকে বলছি, আমি সুতির শাড়ী নেবো
বিক্রেতা ঃ তাই তো দিচ্ছি, আমার কর্মচারীটার নাম বেনারসী।

OOO

ছাত্র ঃ স্যার, **I dont know** মানে কি ?
শিক্ষক ঃ আমি জানি না।
ছাত্র ঃ স্যার, আপনি না জানলে আমরা এর উত্তর কোথা থেকে পাবো ?

সংগ্রাহক ঃ মন্টি দাস, স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষ

তুমি

মানসী ঘোষ
স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

আমি তাকে আজও খুজি
জানালার ধারে দাড়িয়ে
নীল আকাশের পানে চেয়ে
যেন তুমি আসবে .....

বাগানে লাল গোলাপ ফুটেছে
যেন তোমার মৃদু হাসি
কিছু যেন সংকেত দিচ্ছে
কোথায় তুমি তো এলে না...

মেঘের অন্ধকার ঘন ঘটায়
বৃষ্টির ঝিরিঝিরি শব্দ
মনে হল কার পায়ের শব্দ
যেন তুমি আসছো .....

সেই জোনাকি পোকার মত
আমার মনের আলোআধাঁরিতে
কোথায় তুমি তো এলে না...
আসবে কি ? .....

১) রাম একদিন দেখতে পেলো শ শ্যাম মুরগীকে গরম জল খাওয়াচ্ছে। সে জিজ্ঞেস করলো, 'কিরে শ্যাম, তুই মুরগীকে কেন গরম জল খাওয়াচ্ছিস' ?
শ্যাম ঃ আরে জানিস না, গরম জল খাওয়ালে মুরগী সিদ্ধ ডিম পাড়বে।

২) মা ঃ আমি যেখানেই টাকা রাখি রামুটা খুজে বের করে নেয়।
বাবা ঃ টাকাগুলো ওর পড়ার বইয়ের মধ্যে রাখ।

৩) শিক্ষক ঃ তোমরা ক্রিকেটের উপরে রচনা লিখো।
রাজু ঃ স্যার, আমি লিখে ফেলেছি।
শিক্ষক ঃ পড়ে শোনাও।
রাজু ঃ বৃষ্টির জন্য খেলা সম্ভব নয়।

৪) পুলিশ ঃ তোর চুরি করতে লজ্জা লাগেনা ?
চোর ঃ নিশ্চয়ই, তাইতো রাতের অন্ধকারে চুরি করি।

সংগ্রাহক ঃমানসী ঘোষ, স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

ব্যতিক্রমী সূর্যোদয়

ডঃ সুনন্দা দাস
প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান
বাংলা বিভাগ

ষাট অতিক্রান্ত জীবনের পথপরিক্রমায় জলে-স্থলে আকাশে বহুবার বহু পরিস্থিতিতে সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত দেখবার সুযোগ হয়েছে। কিছু স্মরনে আছে, বেশিরভাগই বিস্মরনের ধূলিতে মিলিয়ে গেছে। যা আজও স্মৃতির ঝুলিতে সঞ্চিত আছে সেগুলিও একটা থেকে আরেকটা একেবারে আলাদা স্বাদের, আলাদা অনুভবের। স্বল্প পরিসরের কথা চিন্তা করে আমার জীবনের চারটে ব্যতিক্রমী সূর্যোদয়ের কথা বলছি.....।

২০০৬ সালের ডিসেম্বর মাসের এক পড়ন্ত বিকেলে সিকিমের রাজধানী গ্যাংটক শহরে চারদিনের সময়সূচী নিয়ে আমরা সপরিবারে পৌঁছাই। একটু সময় নিয়েই মাথাগোঁজার আস্তানা ঠিক হলো। শহরটা খুবই ছোট। ঝিরঝিরে বৃষ্টি, গতকালও নাকি কোথাও কোথাও বরফ পড়েছে। চারদিকে টাকমাথা গাছ, তবে ছোট ছোট ঝোঁপঝাড়ের অভাব নেই, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে নাম নাজানা রঙ বেরঙের ফুল, চুপি চুপি তাকিয়ে আছে পথের দিকে - কিসের বা আশায়।

আস্তে আস্তে কুয়াশা হাতের ছোঁয়ায় নেমে আসতে লাগলো। আমরা সন্ধ্যেবেলা শহরটাকে এক চক্কর লাগিয়ে হোটেলে ঢুকলাম। ভোরবেলায় কাঞ্চনজংঘা দেখতে পাব বলে কেউই আশা দেয়নি। ছেলেদের (আমার দুই ছেলে) আশা বরফ পড়া দেখবে। ঘরে ঠাণ্ডাকে জব্দ করার সমস্ত সরঞ্জাম থাকলেও দরজা একটু খুললেই বোঝা যাচ্ছিল এটা পৌষ মাস। কাঞ্চনজংঘা দেখবো সূর্য্যের আলোয়- এই প্রার্থনা নিয়ে বিছানা নিলাম। ভোর চারটেয় ঘুম ভাঙলো। তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করে দিকভ্রান্তের মতো পশ্চিমে- উত্তরে পর্দার ফাঁকে ফাঁকে এদিক থেকে ওদিক আবার ওদিক থেকে এদিক বহুবার চেষ্টা করেও কাঞ্চনজংঘাকে সনাক্ত করা সম্ভব হলনা। বাইরে ঘন কুয়াশার চাঁদর। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে অসংখ্য জোনাকীর মতো রাস্তার আলো। হতাশ হয়ে আবার বিছানা নিলাম। ছোট ছেলের মিসক'ল পেয়ে চোখ মেলে দেখি জানালার বাইরে কুয়াশার পর্দা কে যেন সরিয়ে দিয়েছে, আর দূরে বহুদূরে শ্বেতশুভ্র, গম্ভীর, মহান, সুবিশাল পর্বতশ্রেনী। একটু একটু করে লাল ও সোনা রঙের মিশ্রনে পর্বতশ্রেনীর একটা থেকে আরেকটা- আরেকটা-দুরের আরেকটা, কখনও নীচের থেকে উপরে, কখনও উপর থেকে নীচে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখলাম। প্রায় আধঘন্টা এই দৃশ্য উপভোগ করার পর হঠাৎই কোথা থেকে নেমে এল কুয়াশার পর্দা- কাঞ্চনজংঘাকে ঢেকে দিল। মনে হলো আমি যেন এতক্ষণ ধরে স্বপ্নের জগতে বিচরণ

করছিলাম। সূর্য্যদেব আমার আড়ালে রইলেন। কারণ আমি দক্ষিণ দিক থেকে কাঞ্চনজংঘাকে দেখেছি। মনে মনে সূর্য্য বন্দনা করে সূর্য্যদেবকে আমার প্রণতি জানালাম। নগাধিরাজকে প্রণাম জানালাম। দাজিলিং আমি যাইনি- দেখিনি টাইগার হিল থেকে কাঞ্চনজংঘার গায় সূর্যোদয়ের সাতরঙের খেলা। কিন্তু এমনটিও দেখিনি। একটু একটু করে সোনা রঙে বোলালো পর্বতশ্রেণী। ঈশ্বরের কৃপা নাহলে এমন নৈসর্গিক সৌন্দর্য্য দেখা সম্ভব নয়। আরও তিনরাত ছিলাম, কাঞ্চনজংগা দেখেছি সকালে দুপুরে, কিন্তু সূর্য্যদেবকে দেখা হয়নি, ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে সে দেখা দেয়নি। তাই হয়তো আজও আমার মনের আয়নায় কাঞ্চনজংঘার সেই সূর্যোদয় দেখতে পাই।

২০০৯ সালের অক্টোবর মাসে চৌদ্দদিনের সফরে কম্বোডিয়া ও ব্যাঙ্কক শহরে যাই। আমার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য কীর্তি অ্যাঙ্কর ভ্যাট দেখা। আমার এক ভাইজী কম্বোডিয়ার রাজধানী শহর নংপেনে কর্মরত। ৩০ তারিখ থাই এয়ারওয়েজের বিমান দমদম থেকে রাত দুটোয় ছাড়ল। প্রায় আড়াই ঘন্টা বাদে ব্যাঙ্ককের স্বর্ণভূমি বিমানবন্দরে পা রাখলাম। একঘন্টা পর নংপেন যাবার জন্য থাই এয়ারওয়েজের বিমানে আবার দুইঘন্টার যাত্রা। বিমানবন্দরে সময় কাটাবার জন্য এদিক ওদিক করে একেবারে উপরের তলায় চলে এলাম। এখানে আছে খাবার জায়গা ও কেনাকাটার দোকান। এসব এড়িয়ে একেবারে বিমানবন্দরের সামনের দিকে চলে গেলাম। এদিকটায় আলো নেই জনমানব শূণ্য। বাইরে শেষ রাতের অন্ধকারের মধ্যেও ভোরের আলোর ছোয়া। নীচে দুই একটা গাড়ী, পেছনে কিছু উড়ো জাহাজ, আন্তর্জাতিক এই বিমানবন্দরটি অত্যন্ত ব্যস্ত, গোটা পৃথিবীর উড়ো জাহাজ এখানে উঠা নামা করে। ধীরে ধীরে সকাল হচ্ছে, পাখীর কাকলি শোনা যাচ্ছে, সামনের গাছ-পালা অন্ধকারে ঢাকা। কে যেন ভেতর থেকে বললো -উপরে দেখো, দেখলাম লালরঙের একটা বড় চাকতি শূণ্যে ঝুলছে। কিছু ভাববার বা বোঝবার আগেই চাকতির চতুর্দিকে আকাশ ফুটে উঠলো আর আকাশের গায়ে লাল, হলদে, কমলা, বেগুনীর খেলা। আরো অন্যান্য রঙ থাকলেও খোলা চোখে বুঝতে পারিনি, আর বোঝবার মতো পরিস্থিতিও ছিলনা। এরপর যা দেখলাম তা অতি রোমাঞ্চকর। একটু একটু করে আবছা অন্ধকার সরে গিয়ে হাল্কা লাল আভায় অল্প দূরের পূব আকাশকে অর্ধচন্দ্রের মতো আকাশ(বাকীটা ভেতর থেকে দেখা যায়না) রঙীন হয়ে উঠেছে আর সেই সঙ্গে ধাপে ধাপে বিমানবন্দরের দালানে প্রবেশ করছে আলো। নিঃশব্দে দেখলাম আলো-ছায়ার খেলা। এই বিচিত্র সুন্দরতম দৃশ্য সঞ্চয়ের ঝুলিতে ভরে নিলাম ঈশ্বরের অযাচিত দান বলে।

একই যাত্রায় তৃতীয় ও চতুর্থ অভিজ্ঞতা। নংপেনে তিনদিন থেকে চার তারিখ

সিয়ামরিপে যাত্রা করি অ্যাঙ্কর ভ্যাট দেখার উদ্দেশ্য নিয়ে। রাত থেকেই বৃষ্টি। উড়োজাহাজ থেকে সিয়ামরিপকে আসামের যে কোন অঞ্চল বললে ভুল হবেনা। চারপাশে খাল-বিল জলে টই-টম্বুর। সেদিনই চারদিনের পাশ সংগ্রহ করি অ্যাঙ্কর দেখবার জন্য। জনপ্রতি আমেরিকান ৪০ ডলার। ১,২,৩ ও ৭ দিনের পাশ পাওয়া যায়। আমরা বিকেলে উপরে উপরে কিছু জায়গা দেখলাম।

৫ ই নভেম্বর ভোর রাতে উঠে অ্যাঙ্কর ভ্যাট দেখতে বেড়িয়েছি। ভোরবেলা যাবার উদ্দেশ্য ভ্যাটের সামনে থেকে সূর্যোদয় দেখা। এটা একটা অতি জনপ্রিয় স্থান, বিশেষ করে সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখার জন্য। অ্যাঙ্কর ভ্যাট বিশ্বের সর্ববৃহৎ ধর্মীয় মন্দির ও স্থাপত্য কলা বলে লোকের ধারনা। এক বৃহৎ জায়গা জুড়ে প্রায় ৬০০ বৎসরের ইতিহাসের সাক্ষী স্বরূপ দাড়িয়ে আছে অ্যাঙ্কর ভ্যাট। ভ্যাট মানে মন্দির। এই মন্দিরটি বহুতল, এর গঠনশৈলী, বিভিন্ন মূর্ত্তি, দেওয়ালের ভাস্কর্য্য পর্য্যটকদের বিস্মিত ও স্তব্ধ করে দেয়। যাই হোক ভোর রাতে হালকা ঠাণ্ডায় আলো আঁধারে নির্জন অরণ্যের মাঝে দক্ষিণ ভারতের গোপুরমের মতো মন্দিরের প্রবেশদ্বার মন্দির বলে ভুল হয়- জানা নাথাকলে। কেমন যেন একটা গা ছমছম করা পরিবেশ। ঝিঁঝি পোকা ও পাখীর কূজনের সঙ্গে অল্প অল্প করে পূর্বদিকে আলো ফুটছে আর পরিখার জলে মন্দিরের প্রবেশদ্বারের প্রতিবিম্ব ফুটে উঠছে। দূর আকাশ লাল আলোয় আলোকিত। সেখানে উপস্থিত দেশ-বিদেশের প্রায় শতাধিক মহিলা পুরুষ। স্থানীয় গাইড অতি মৃদুস্বরে ভেতরে যাবার জন্য বলেন। সেখানে যে কত বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল আমার জন্য। প্রবেশদ্বার থেকেই দেখি পশ্চিম মুখ করে পাঁচ মিনার সহ বেলে পাথরের কল্পনাতীত বৃহৎ অট্টালিকা। বিশাল-বিশাল-অতি বিশাল মন্দিরটির বৃহৎ প্রাঙ্গনে একটি ঝিল, তাতে শালুক ফুটে আছে আর সেই মন্দিরের পেছন থেকে সূর্য্যের আলোয় তার প্রতিবিম্ব ঝিলের জলে। সূর্য্যদেব আমাদের দৃষ্টির বাইরে। এই দৃশ্য বর্ণনাতীত। পরিবেশের গুনে আরো রোমাঞ্চকর। প্রকৃতির বিশাল বুকে প্রাচীন ইতিহাসের সাক্ষীর সামনে দাড়িয়ে আমি হতবাক। বার বার মনে হয়ে ছিল - চাঁদ বণিকের কথা, চণ্ডীমঙ্গল উপাখ্যানের শ্রীমন্তের কথা। ভারতীয় পুরানের কাহিনী এদেশের মাটিতে, সংস্কৃতিতে মিশে আছে। তবে আজকের প্রজন্ম অতীতকে তেমনভাবে জানতে আগ্রহী নয়। যতটা সম্ভব ছবি তুলেছি কিন্তু সূর্যোদয়ের যে ছবি চোখ দিয়ে, প্রাণ দিয়ে প্রত্যক্ষ করেছি, অনুভব করেছি তা ভাষায় প্রকাশ করা যায়না। কতটা কল্পনাশক্তি, সৌন্দর্য্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক কারুকুশলতা থাকলে এমন শিল্পকর্ম সম্ভব হয়, তা আজ গবেষনার বিষয়। এবার বিদায়ের পালা। অ্যাঙ্কর থেকে ফিরে ভাইজীর কাছে দুদিন থেকে ব্যাঙ্কক, এখানে চারদিন ছিলাম। হোটেলের ৮ তলার দেওয়াল বরাবর কাঁচের জানালা থেকে সূর্যোদয়

দেখেছি ঠিকই কিন্তু ১২ই নভেম্বরের অভিজ্ঞতা একেবারে আলাদা। ১১ তারিখ রাত দেড়টায় ব্যাঙ্কক থেকে দমদমে এসে পৌঁছায়। পরদিন ভোর ৫.৪৫ মিনিটে জেট এয়ারলাইন্সের বিমানে গুয়াহাটী যাত্রা। ভোর চারটায় আন্তজার্তিক বিমানবন্দর থেকে বেড়িয়ে এলাম- দেশীয় বিমানবন্দরে যেতে হবে। বাইরে অন্ধকার, কে বলবে এটা অতি ব্যস্ততম কোলকাতা শহর। যাইহোক নির্দিষ্ট সময়ে উড়োজাহাজে বসলাম, সময় মতই ছাড়লো, খুব কম যাত্রী। জানালার পাশেই আসন, ততক্ষণে উড়োজাহাজ মাটি ছেড়ে আকাশে উড়তে শুরু করে দিয়েছে - দিক পরিবর্তন করতেই দেখলাম সর্বপাপ বিনাশকারী সূর্য্যদেব বিমানবন্দরের সীমানা ছাড়িয়ে দিগন্ত পারে গাছ-গাছালির পেছন থেকে বেড়িয়েছে। একটা স্নিগ্ধ পরশ থাকা রক্তিম আভা ছড়িয়ে। উড়োজাহাজ দূরন্ত গতিতে ছুটছে আর ছুটছে, এদিকে জবা ফুলের রঙে রঙীন হয়ে সূর্য্যদেব ধীর, শান্ত, সমাহিত ভাবে রক্তিম আলোর আভা ছড়িয়ে আকাশের কোলে মেঘের গায় বিচিত্র বর্ণের চিত্র তৈরী করেছেন। মাটি থেকে তখন উড়োজাহাজ বহু হাজার ফুট উপরে। খুব অল্প সময়ের জন্যই এই রামধেনুর খেলা দেখতে পেলাম। লাল রঙের গোলাকার পিণ্ডটাও কখন যেন হারিয়ে গেল। আমি আড়াই বৎসর বয়স থেকে প্রায় দুশোবারেরও বেশি উড়োজাহাজে যাত্রা করেছি। ভোরবেলায় অনেকবার উঠা-নামাও করেছি, কখনও দেশে, কখনও বিদেশে, কিন্তু এমনটি কখনও দেখিনি। এই চারটি ব্যতিক্রমী সূর্যোদয়ের কথা আমার মনের মণিকোঠায় চির জীবনের জন্য সঞ্চিত থাকবে। সুযোগ পেয়ে কথাগুলো বললাম।

○○○

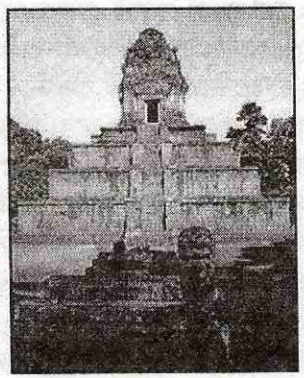

মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য কীর্তি
অ্যাঙ্কর থম, কম্বোডিয়া

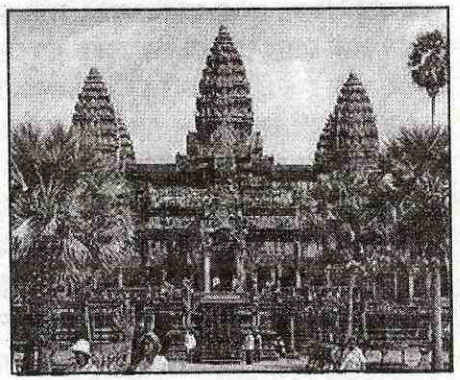

মধ্যযুগের ভারতীয় স্থাপত্য কীর্তি
অ্যাঙ্কর ভ্যাট, কম্বোডিয়া

বর্তমান সংস্কৃতির সংকট

রঞ্জনা সেন
বিভাগীয় প্রধান
অর্থনীতি বিভাগ

জীবনের উপান্তে এসে ১৯৪০ সালে শেষ জন্মদিনের ভাষনে রবীন্দ্রনাথ একটা সংকটের কথা বলেছিলেন। সেটা ছিল সভ্যতার সংকট। ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী ভূমিকা সেদিন কবিকে দিয়েছিল গভীর মর্মবেদনা। যা কিছু মানবিক, যা কিছু শুভ চেতনার দ্যোতক তার ওপর অপসংস্কৃতির কালিমা লেপনের প্রক্রিয়া ততদিনে শুরু হয়ে গেছে। পাশ্চাত্যের জ্ঞানগরিমার প্রতি আজন্মলালিত বিশ্বাস কবির মন থেকে নিঃশেষে লুপ্ত। তাকেই তিনি বলেছিলেন সভ্যতার সংকট। এই সভ্যতার আর একটি বিশ্লেষণ আমরা পাই মহান হিন্দী কবি প্রেমচন্দের লেখায়। ১৯৩৬ সালে তিনি তাঁর সেই ঐতিহাসিক দলিলের শিরোনাম দেন 'মহাজনী সভ্যতা'। ধনতন্ত্রের জয়গানে যারা-আজ উচ্চকণ্ঠ ও নৃত্যের উল্লাসে উর্ধবাহু তারা এই দুই মহান ভারত সন্তানের এই দুটি রচনা অনুপুঙ্খ পাঠ করলে বর্তমান সংস্কৃতির সংকটের চেহেরাটা পরিস্কার দেখতে পাবেন।

আমাদের শ্রেয়বোধ থেকেই সংস্কৃতির উদ্ভব। জীবনচর্চার মাধ্যমে সংস্কৃতির মূল্যবোধ গড়ে ওঠে এবং প্রজন্ম পরম্পরায় তা প্রবাহিত হয় উত্তরকালে। আত্মিক(Spiritual) এবং বৈষয়িক (Material) উভয়স্তরেই সংস্কৃতির উদ্ভব ও বিকাশ মানবগোষ্ঠির স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত করে। এমনকি নিরক্ষর জনসমাজেও গড়ে ওঠে জীবনভিত্তিক সংস্কৃতিচেতনা। ঘরের দাওয়ায় যে গৃহবধূ আলপনা দেন, যে কুম্ভকার বিশেষ ধরণের কলসীটি কিংবা পোড়া মাটির ঘড়াটি তৈরী করেন, তার দক্ষতা থেকেই বেরিয়ে আসে এক সংস্কৃতিবোধ যার সঙ্গে বিদ্যাচর্চা বা অক্ষরজ্ঞানের কোনো যোগ অপরিহার্য্য নয়। কিন্তু এই সংস্কৃতি একটি জনসমাজের এবং জনগোষ্ঠির একান্ত নিজস্ব। তাকে বাদ দিলে বা বিকৃত করলে তা সংস্কৃতির ওপর এক ধরণের বলাৎকার বলেই চিহ্নিত হবে। সংস্কৃতি চেতনার মধ্যে থাকে মানবিক মঙ্গলকামনা এবং সামাজিক ন্যায়বিচার বোধ। এই কারণেই যখন আমরা জাতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যচেতনার কথা বলি তখন তার মাধ্যমে জাতীয় কল্যাণ ও জনগোষ্ঠির সংহতি রক্ষার আকাঙ্খা প্রকাশিত হয়। সংস্কৃতির একটা বিশ্বপরিধিও আছে। কিন্তু নিজস্ব সংস্কৃতির চর্চা ও অনুষ্ঠান ব্যতীত বাইরের কোনো প্রভাবে গা ভাসিয়ে দিলে তা সংস্কৃতি চেতনার অভাবেরই পরিচায়ক।

আজকের সময়ে সংস্কৃতির সংকটের কথা যখন বলি তার নিহিতার্থ হল, নিজস্ব সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ সম্পর্কে অবজ্ঞা এবং কতগুলো আরোপিত চিন্তা বা জীবনযাপন ভঙ্গির প্রতি অন্ধ আনুগত্য। তথাপিও আমরা দেখতে পাই ভারতীয় সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ দিকগুলো জনমানসে চিরায়তভাবে তার মর্যাদা লাভ করেছে, যদিও শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক

সংস্কার বর্জিত হয়েছে। নারী ও পুরুষের সম্পর্কের কথাই ধরা যাক। নারীকে কিভাবে তার নায্য মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা করা যায় তার জন্য প্রাতঃ স্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তা আমাদের সামাজিক আন্দোলনের এক দিকনির্দেশিকা।

এখন নারীকে বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় নামিয়ে যদি প্রচার করা হয় যে এটাই নারীমুক্তির এক চরম নিদর্শন তাহলে তা হবে সত্যের বিকৃতি। দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞাপনে, বোম্বাইমার্কা ছবিতে, সঙ্গীত নৃত্য প্রদর্শনীতে নারীকে পণ্য করে তোলা হচ্ছে। নারীত্বের এই অবমাননা আমাদের সংস্কৃতির মূল্যবোধ ও জীবনদর্শনকে এক গভীর সংকটের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। ইচ্ছাকৃতভাবেই তা করা হচ্ছে, যখন নারী আন্দোলন বহু সংগ্রামের পর নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য এক উল্লেখযোগ্য পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তখন নারীর চিরাচরিত একটা রূপকে সামনে রেখে তাদের মানবী সত্তাকে অপমান করাই এই শ্রেণীর প্রচারকদের উদ্দেশ্য।

এখন পৃথিবীতে বানিজ্যিক লড়াইয়ের সঙ্গে চলছে সাংস্কৃতিক লড়াই। কোনো দেশ তার স্বাধীনতার সঙ্গে আপস করলে যেমন তার অস্তিত্ব থাকে না, তেমনি তার সংস্কৃতি বিসর্জন দিলে, পিতৃ-পিতামহের পরিচয় হারায় তার বাসিন্দারা। নিজের ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা হারানো কোনো জনগোষ্ঠির পক্ষে অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু আমরা দেখতে পাই যে, ইংরাজী ভাষা না শিখলে জীবন বৃথা বলে মনে করে এক শ্রেণীর পিতা-মাতা কনভেন্ট আর ইংরাজী মিডিয়াম স্কুলের সামনে ছেলে-মেয়েদের নিয়ে দীর্ঘ লাইনের পেছনে অপেক্ষারত। এটাও সাংস্কৃতিক সংকটের একটি দিক। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত মনীষীরা মাতৃভাষার প্রচার ও সমৃদ্ধির জন্য একাগ্রচিত্ত সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যায়ে এসে দেখা যাচ্ছে যে মাতৃভাষাকেই বিমাতৃসুলভ আচরণে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য কত যুক্তির জাল বিস্তার হয়েছে। সংস্কৃতির সংকট যে কত গভীরে গিয়ে পৌঁছেছে, মাতৃভাষার প্রতি অনাদর তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

আশার কথা, এই শ্রমজীবী-কৃষিজীবী সাধারণ মানুষ, যারা আবহমানকাল ধরে দেশের মাটির স্পন্দন-ধ্বনির সঙ্গে পরিচিত, তারা প্রতিদিনের জীবন সংগ্রামের মাধ্যমে দেশ ও কালের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য রক্ষা করে। সংকট কালেও তাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনবোধ প্রকৃত সাংস্কৃতিক শুদ্ধতার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়।

এর বিরুদ্ধে সচেতন হওয়া অতি প্রয়োজন। তরুণ প্রজন্মের ওপর এই সাংস্কৃতিক বিকৃতির প্রতিক্রিয়া হয় সবচেয়ে ক্ষতিকর। যে শিশুরা বড় হয়ে তারুণ্যে প্রবেশ করবে তাদের সামনে সংস্কৃতির শ্রেয় দিকগুলি সচেতনভাবে তুলে ধরতে না পারলে দেশের মাটির শেকড় থেকে তাদের সম্পর্ক একদিন সহজেই আলগা হয়ে যাবে। সেজন্য পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ সুস্থ রাখা দরকার, যেখানে শিশু কিশোর ও তরুনরা সুস্থ সাংস্কৃতিক চেতনা নিয়ে তাদের জীবনের আদর্শ অনুকরণ করতে পারবে।

ooo

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা ঃ প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'নবজাতক' কাব্য

সঞ্জয়চন্দ্র দাস
বাংলা বিভাগ

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা রবীন্দ্র-সাহিত্যের অন্যতম আরেকটা দিক। রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য রচনার মতো 'নবজাতক' কাব্যেও এই চেতনা বিশেষভাবে ফুটে উঠেছে। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার দৈত্যরূপ, অর্থগৃধ্নু সমাজ ব্যবস্থার মুমূর্ষু চিত্র, সভ্যতার বিকৃত রূপ, মানবিকতার ধ্বংসাত্মক ছবি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে এ কাব্যে প্রকাশ পেয়েছে অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার সোচ্চার ঘোষণা, পৃথিবীর সমস্ত রকম অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে কবিহৃদয়ের বিদ্রোহ ও ঘৃণা। আবার কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির ছোঁয়া, দার্শনিক মনোভাবের সঙ্গে সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে আশাবাদ ও গভীর বিশ্বাস। জগৎ ও জীবনকে ভালোবাসার সঙ্গে মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছে তাঁর কাব্যে। তাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবনাও তাঁর একাব্যে স্বাভাবিকভাবে এসে পড়েছে।

ইংরাজ শাসনের যুগে যখন ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য নবজাগরণের ঢেউ এসে লেগেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথের পরিবারেও সেই নবজাগরণের ছোঁয়া লাগে। তাই ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিক সভ্যতার মধ্যে বড় হলেও জাতীয় চেতনায়ও সেই পরিবার যথেষ্ট পুষ্ট ছিল। ১৮৮৩ খ্রিষ্টাব্দে 'সাধনা' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ যে প্রবন্ধগুলি প্রকাশ করেছিলেন সেখানে তাঁর জাতীয় ভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর 'স্বদেশ ও সমাজ' প্রবন্ধে জাতীয় চেতনার কথা বলতে গিয়ে তিনি 'আত্মমুক্তি'র কথা বলেছেন। তাঁর মতে সংকীর্ণ রাজনৈতিক দলাদলির পরিপ্রেক্ষিতে বাইরের দিক থেকে শুধু স্বাধীন হলে চলবেনা, আসলে অন্তরের দিক থেকেই মুক্তি লাভ করা চাই। তখনই হবে প্রকৃত মুক্তি বা প্রকৃত স্বাধীনতা। এই মনোভাব তাঁর বহু রচনায় ফুটে উঠেছে— বিভিন্ন উপন্যাস যেমন, 'গোরা', 'ঘরে-বাইরে', 'চতুরঙ্গ', 'তিনসঙ্গী' গল্পগ্রন্থ এবং বিভিন্ন প্রবন্ধ ও 'ছিন্নপত্রে'র বিভিন্ন জায়গায় তা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লক্ষ্য করা যায়। আত্মমুক্তির জন্য চাই আত্মচেতনাবোধ, তাই দেশের মানুষ যদি নিজের দুর্বল দিকগুলিকে বর্জন করে আত্মশক্তিতে আত্মনির্ভরশীল হয়ে মুক্তি লাভ করতে পারে– অশিক্ষা, কুসংস্কার, অধর্ম প্রভৃতি বর্জন করে আত্মসচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে তবেই হবে প্রকৃত জাতীয়তাবোধ, প্রকৃত স্বদেশ প্রেম।

জমিদারী পরিদর্শন করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ একদিকে যেমন পূর্ববঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়েছিলেন, অন্যদিকে তেমনি সেখানকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষদের দুর্দশা

দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন। সেই মানুষদের দুঃখ-বেদনা তিনি হৃদয় দিয়ে অনুভব করতেন। 'চিত্রা' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় তাঁর মর্ত্যপ্রেম ও সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদ স্বাভাবিক ভাবে এসে পড়েছে। মানুষকে ভালোবাসতেন বলেইতো তাঁর মধ্যে আন্তর্জাতিক চেতনা জেগে উঠেছিল। তাই বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিশ্বজাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য তিনি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় 'রাখিবন্ধন' উৎসবের সূত্রপাত করেন। আন্তর্জাতিক স্তরে মানুষের সঙ্গে সমানভাবে মিশে গিয়ে তিনি তাঁদের সুখ দুঃখ অনুভব করে তাঁদেরকে আপন করে নিতে পেরেছিলেন। এই সমস্ত সাধারণ মানুষদের প্রতিনিধি হয়ে তিনি সারা জীবন প্রতিবাদ করে গেছেন অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে। বিজ্ঞান সভ্যতা, যান্ত্রিক শক্তি, মানব সভ্যতাকে কীভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে, সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাধারণ মানুষদের কীভাবে নিষ্পেষিত করেছে— এই সব ভাবনা থেকেই তাঁর মধ্যে জন্ম নিয়েছে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিক চেতনাবোধ। 'নবজাতক' কাব্যের অনেক কবিতায় তাঁর এই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

'নবজাতক' কাব্যের যে সমস্ত কবিতায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা ধরা পড়েছে, সেগুলি হলো— 'বুদ্ধভক্তি', 'উদ্‌বোধন', 'প্রায়শ্চিত্ত', 'শেষদৃষ্টি', 'জয়ধ্বনি', 'আহ্বান' (কানাডার প্রতি), 'পক্ষীমানব', 'হিন্দুস্থান', 'রাজপুতানা' প্রভৃতি।

পৃথিবীর দুর্বল মানুষের উপর শক্তিমানের দম্ভ, অহংকার, শোষণ যে কীভাবে তাদের নিষ্পেষিত করেছে তারই বর্ণনা এবং প্রতিবাদ মুখরিত হয়ে উঠেছে 'প্রায়শ্চিত্ত' কবিতায়। কবি বলেছেন— "উপর আকাশে সাজানো তড়িৎ আলো/ নিম্নে নিবিড় অতি বর্বর কালো/ ভূমিগর্ভের রাতে—" আবার বলেছেন— 'দুঃসহ তাপে গর্জি উঠিল/ ভূমিকম্পের রোল, জয়তোরণের ভিত্তিভূমিতে লাগিল ভীষণ দোল।" পৃথিবীর এই অশান্তময় অমঙ্গলের যে প্রতাপ তাকে তেজের দ্বারা, বিক্রমের মধ্যদিয়ে কল্যানশক্তির যজ্ঞানুষ্ঠানের মাধ্যমে প্রায়শ্চিত্ত করে বিকৃত পৃথিবীর মধ্যে শান্তির শুভবার্তা নিয়ে আসতে হবে— তখনইতো নতুন আলোয় নতুন দেশে জেগে উঠবে নবজীবনের গান। তাই কবিতার শেষে কবি বলেছেন—

'ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত, পূর্ণ করিয়া শেষে/ নূতন জীবন নূতন আলোকে/ জাগিবে নূতন দেশে।"

দুর্বল ও অসহায় মানুষের উপর সাম্রাজ্যবাদী, শক্তিশালী মানুষের অত্যাচার 'বুদ্ধভক্তি' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। এই কবিতার পিছনে একটি ঐতিহাসিক কাহিনি আছে। ১৯৩৭ সালের শেষের দিকে জাপানীরা বোমার আঘাতে চীন দেশকে যেভাবে বিধ্বস্ত করেছিল এতে চীনের শিশু, বৃদ্ধ, মহিলারা কেউই রেহাই পায়নি। এতে কবি গভীর ভাবে ব্যথিত হন এবং ১৩৪৪ সালে পৌষ উৎসবের দিন ভাষণে চীনের প্রতি তিনি সমবেদনা প্রকাশ

করেন। সেই বছরেই মাঘ মাসে 'প্রবাসী' পত্রিকায় 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' নাম দিয়ে একটি পদ্য- কবিতা প্রকাশ হয়। তারপর 'পত্রপুট' কাব্যের ১৭ নং কবিতা রূপে সংকলিত হয় কবিতাটি। এরপর নতুন ছন্দে ও ভঙ্গিতে নতুন ভাবে কবিতাটি 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় "বুদ্ধভক্তি" নামে। কবিতাটিতে রয়েছে জাপানের প্রতি তীব্র ব্যঙ্গ ও প্রতিবাদ। বুদ্ধদেব হলেন করুনার সাগর তিনি পৃথিবীতে মহাশান্তি চান, বৌদ্ধধর্মের মূল মন্ত্রই হল অহিংসা। অথচ সাম্রাজ্যলোভী পিশাচ জাপানীরা হিংসার মধ্য দিয়ে হিংস্র জন্তুর মতো পৃথিবীর শান্তি ভঙ্গ করতে সেই করুণাময় বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করতে গেছে। দম্ভ, অহংকার ও বিষাক্ত বাণের আঘাতে শুভবুদ্ধির নিশ্বাস রুদ্ধ করতে চাইছে— 'মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে/বুদ্ধদেবে নিতে নিজ দলে।' কিন্তু এই অজ্ঞানতা ও মূঢ়তার দ্বারা যে তারা নিজেদের ধ্বংসকেই আহ্বান করে আনছে সেই বিশ্বাসবোধই এই কবিতায় ফুটে উঠেছে।

"Empire Day Programme' উপলক্ষ্যে রেডিওতে সম্প্রসারণের জন্য কানাডা দেশ থেকে অনুরোধ করেন একটি কবিতা যেন রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দেন। এই উপলক্ষে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ 'আহ্বান' কবিতাটি লিখে অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেন। সেই বছর ১৯ মে তারিখে রেডিওতে প্রচারিত হয়। 'আহ্বান' কবিতাটি কানাডা দেশের প্রতি উৎসর্গিত। সেই ছোট, দুর্বল, দেশ কানাডার অসহায় মানুষদের আহ্বান করে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে একমাত্র তারাই অমঙ্গলের দ্বারা আক্রান্ত পৃথিবীর ভার মুক্ত করতে পারবে। তাই কানাডাবাসীদের উৎসাহ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে/ মুক্তিরণ ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে/ তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।"

'পক্ষীমানব' কবিতায় যান্ত্রিকতা ও বিজ্ঞানের অশুভ দিককে দেখিয়েছেন। সেখানে তিনি বলেছেন, "যন্ত্রমানব, মানবে করিলে পাখি।/ স্থল জল যত পর পদানত/আকাশ আছিল বাকী।" কিন্তু মানুষ আকাশকেও জয় করে নিয়েছে, আবিষ্কৃত হয়েছে এরোপ্লেন— যার কু-ব্যবহার আজ আমরা পদে পদে চাক্ষুষ করছি।

'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতনা' কবিতায় জাতীয় চেতনা ফুটে উঠেছে। কবিতা দুটিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। দেশের মানুষ মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে না পারলে 'হিন্দুস্থান' ও 'রাজপুতানা' কবিতার পরিণাম হবে। 'হিন্দুস্থান' কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে ইতিহাসের কত জাতির দম্ভ, অহংকার, জয়-পরাজয়, কিন্তু আজ সবই বিলীন। 'ভগ্নজানু প্রতাপের ছায়া সেথা শীর্ণ যমুনায়/ প্রেতের আহ্বান বহি চলে যায়,/বলে যায়— /আরো ছায়া ঘনাইছে অস্তদিগন্তের/জীর্ণ যুগান্তের।।" 'আরো ছায়া ঘনাইছে' কথাটির মধ্যে তৎকালীন পরাধীন ভারতের স্বাধীনবার্তা ঘোষিত হয়েছে। অর্থাৎ ইংরাজদের পতনও ঘনিয়ে এসেছে। 'রাজপুতানা' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ রাজপুতানাদের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ

করে তাঁদের শৌর্য, বীর্য ও বীরগাথা বর্ণনা করেছেন। অথচ আজ আমরা সেই অতীত ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা না করে তাঁদের বীরকাহিনিকে নিয়ে রমরমা গল্প রচনা করছি, ছবি আঁকছি, নাট্যমঞ্চে মেকি অভিনয় করে বড় বড় কথা বলছি। তাই কবি দুঃখ পেয়ে ধিক্কার দিয়ে বলেছেন— "প্রচণ্ড সত্যেরে ভেঙে গল্প রচে অলস কল্পনা।/নিষ্কর্মার স্বাদু উত্তেজনা,/ নাট্যমঞ্চে ব্যঙ্গ করি বীর সাজে/তারস্বর আস্ফালনে উন্মত্ততা করে কোন লাজে।"

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে হিংসা, দলাদলি, রক্তপাত— এখানেই মানুষের শেষ নয়। 'শেষদৃষ্টি' কবিতায় তিনি বলেছেন যে বেদনাগুলিই মানুষের শেষ সত্য নয়, মানুষের শুভ প্রকৃতি একদিন জেগে উঠবে সেদিন মানুষ সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারবে। 'উদ্‌বোধন' কবিতায়ও সেই কথা ফুটে উঠেছে। আবার 'জয়ধ্বনি' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে মানুষের জন্য তিনি কিছুই করতে পারেন নি। তিনি লিখেছেন 'মানুষের অসম্মান দুর্বিষহ দুখে/উঠিছে পুঞ্জিত হয়ে চোখের সম্মুখে,/ছুটিনি করিতে প্রতিকার—/ চিরলগ্নে আছে প্রাণে ধিক্কার তাহার।।"

রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন পৃথিবীকে, ভারতবর্ষকে অনেক কিছু দিয়েও বিনীত ভাবে বলেছেন যে তিনি মানুষের জন্য কিছুই করতে পারেননি। তিনি মানুষের শুভশক্তিকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তিনি অনুভব করেছেন যে পৃথিবীর দুঃখ যন্ত্রণা থাকবেনা— একদিন মানুষের সত্যদৃষ্টি, শুভদৃষ্টি উন্মোচিত হবে। আসলে রবীন্দ্রনাথ আশাবাদের মধ্যদিয়ে নবজীবনের অফুরন্ত পথ চেয়ে আছেন। রবীন্দ্রনাথের শেষ বিশ্বাস 'আত্মমুক্তি'র মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা আসবে, পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন হবে। এইভাবে 'নবজাতক' কাব্যে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চেতনা ফুটে উঠেছে।

ooo

সহায়ক গ্রন্থ ঃ

১। দাস, ক্ষুদিরাম ঃ 'রবীন্দ্র প্রতিভার পরিচয়' পুনর্মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর, ২০০২, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা-৯

২। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত ঃ 'বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত' পুনর্মুদ্রণ ২০০২-০৩, মডার্ণ বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩।

৩। রায়, নীহাররঞ্জন ঃ 'রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা' ষষ্ঠ সংস্করণ, অগ্রাণ, ১৪১০, নিউ এজ পাব্লিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩

মাতৃ -তর্পণ

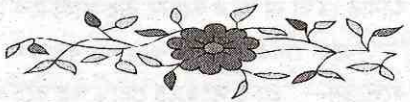

মলিনা চৌধুরী
অতিথি লেখিকা

ভোরে ঘুরতে বেরিয়ে শান্তি পাচ্ছিনা, ক'দিন ধরে। পাড়াতেই পূজো, পূজো কর্তারা ধরেছেন -মেসো একটা কিছু লিখে দিন আমাদের ম্যাগাজিনের জন্যে। কিন্তু আমি এখন আর পারিনা। বয়স হলো, শরীরের, মনের জোর কমেছে। দৃষ্টিশক্তি ও কমেছে। আর কতো? কিন্তু অন্যরা দিলে তবেই তো? বিশেষ করে আমার শ্রীমতি....। সবার কাছে আমার ভাবমূর্তি একটু কঠোর। আবার আমার স্ত্রী সবার কাছে দয়ার মূর্তি। তাই আমার কাছে যদি কেউ সুবিধা করতে না পারলো.....তাহলে.....আমার স্ত্রী এখনও বর্তমান। মাসীমা একটু দেখবেন...

সকালে চায়ের কাপের সঙ্গে, দুপুরে খাবার টেবিলে, সন্ধ্যের চায়ের আসরে একটাই ঝঙ্কার - কী হলো? ওদেরকে একটা কিছু লিখে দিলেই পারো? পাড়ারই তো ছেলেরা? স্ত্রী মুখের দিকে তাকালাম, কথায় ঝঙ্কারের রেশ পাওয়া গেল। বললাম - আজকাল আর হাত, মন চলতে চায়না। আমার মতো একজন লোকের সঙ্গে এতো বছর ঘর করলে, যাহোক তুমি ও তো কাজটা চালিয়ে নিতে পারো। এরপর স্ত্রীর বড় বড় চোখের কৌণিক চাউনী দেখেই বলতে বাধ্য হ'লাম -আচ্ছা বাবা দেখছি কী করা যায় । স্ত্রী বুঝলেন কাজ হলো। বললেন, 'একটু চা দেবো? এক্ষুনি বসবে?' মাথা দিয়ে ইতিবাচক ভঙ্গি করলাম। একটু পর চা এসে গেলো। খাতা-পত্র, কাগজ কলম সব এসে টেবিলে হাজির হলো। আজকাল আমি লেখা-লেখিতে অনিয়মিত, তাই আমার স্ত্রী সবকিছু গুছিয়ে রেখে দেন। প্রয়োজনে আমি বের করি। আজ উনি বের করে দিলেন।

চেয়ারে গিয়ে বসলাম। একটুখানি হেলান দিয়ে একটু বিশ্রাম নিলাম । চিন্তা করলাম কি লিখব? মাথায় আসলো সকালে টিভিতে দেখা খবর- মেয়ে ব্যবসায়, হত্যা, লুণ্ঠন, বন্যা, খরা, খাদ্যাভাব, ব্যভিচার - কতো কিছু। কোনও কিছুরই শেষ পাচ্ছিনা। আমি জানি, আমি অনুভব করি-লেখক হিসেবে আমার কাজ শুধু একটা গল্প বানিয়ে লিখে দেওয়াই নয়। গল্পের পাঠকরা আশাকরে একটা সুন্দর সমাপ্তি। আনন্দবাচক গল্প। একজন লেখকের কাজ-শুধু গল্পাকারে ঘটনাকে উপস্থাপন করাই নয়, সেটার ইতিবাচক, আশাপূর্ণ , আনন্দযুক্ত উপসংহারটাও লেখকের কর্তব্য।

...তবুও সবকিছুতে যুক্তি বা বাস্তবিকতার প্রয়োগ করা যায়না। যেমন এখন আমার মাথায় কিছু আসছে না। কতক্ষণ এভাবে ভাবছিলাম জানিনা। আমার স্ত্রী এসে বললেন, 'কীগো শুয়ে পড়লে নাকি?' আমি হাত নাড়িয়ে জানালাম যে আমি জেগে আছি। স্ত্রী পাশের চেয়ারে বসে বললেন, 'আচ্ছা, একবার একটি মেয়ে তোমাকে কিছু লিখতে বলে গিয়েছিলো, এক টুকরো কাগজে কিছু লিখেও দিয়ে গিয়েছিলো। সেটা কী কোথাও পাঠিয়েছ?' আমি মনে করতে চেষ্টা করলাম। শ্রীমতী বললেন, 'ঐ যে গো আমাদের সামনের বাড়িটাতে থাকতো, কালো করে মেয়েটি ভাড়া থাকতো... কী হলো, মনে পড়লো?'

স্ত্রীর কথাতে বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়লো একটি মেয়ের কথা। ঠিকইতো মেয়েটি আমাদের সামনের বাড়ীতে থাকতো। ও ওর মার সঙ্গে থাকতো, বাবাকে ছোটবেলাতেই হারিয়েছে। মা ছোটখাটো কিছু একটা চাকুরী করতেন। মেয়েটির কাছে কিছু ছাত্র পড়তো, নিজেও পড়তো। এই করে ভালো পাশ ও করলো। কালো মেয়ে পাত্র পাওয়া যায়নি... ঐ নিয়ে গরীব মা মাথা ঘামাবার সময় পায়নি। আমার স্ত্রীর মুখেই শোনা কথা - দুএকটা পাত্রের খবর এসেছিলো নাকি, কালো মেয়ে নেবে -তবে সঙ্গে থাকতে হবে স্বর্ণের আলো। হলো না তাই বিয়ে ।

আমি চাকুরী থেকে অবসর নেবার পর যখন লেখা নিয়ে খুব ব্যস্ত, এই সভা-সমিতি, অভ্যর্থনা, সম্বর্ধনা ইত্যাদি নিয়ে যখন খুবই ব্যস্ত - একদিন আমার শ্রীমতি বললেন - শুনছো গো এবাড়ীর মেয়েটির মায়ের শরীর খুবই খারাপ, আমার ইচ্ছে একটু সাহায্য করি ওদেরকে। আমি কাজে ব্যস্ত থেকেই জিজ্ঞেস করলাম - কেন ওদের কেউ নেই? স্ত্রীর উত্তরে জানলাম- সবাই ই আছে। সবাই দূরে-দূরে থাকে। এসেছে, আসছে, ছোট্ট ঘর, থাকার সুবিধে নেই, তাই বেশীদিন কেউ থাকছে না, মেয়েটি যেভাবে পারছে সবার সাহায্য সহযোগিতায় মাকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্ঠা করছে। আমি বললাম করে দাও তোমার যা সুবিধে হয়।

তারপর বেশ কিছুদিন গড়িয়ে গেলো। আমার দিনগুলো খুব ব্যস্ততার মধ্যে আরও তাড়াতাড়ি গড়িয়ে যাচ্ছিলো। এরমধ্যে একদিন আমার স্ত্রী খবর দিলেন সেই মহিলা মারা গেছেন। আমি ইস্, আহা ছাড়া আর কিছু বলবার পেলাম না। আরও দিন কিছু গেলো, একদিন সন্ধ্যেয় আমার স্ত্রী আমার লেখার টেবিলের সামনে দাঁড়ালেন। সচরাচর যেটা হয়না -সেটা করাতে আমি বললাম, কী হলো কিছু দরকার? স্ত্রী বললেন তোমার সঙ্গে দেখা করতে ঐ মেয়েটি এসেছে। বুঝতে পারলাম না কোন মেয়ে। স্ত্রীর অঙ্গুলী নির্দেশ অনুসারে দরজার দিকে তাকালাম। মেয়েটি আসলো আমার কাছে। পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো। আমার স্ত্রী বললেন ঐ যে গো আমাদের সামনের বাড়ীর। মা মারা গেলেন ক'দিন আগে। বুঝলাম। বললাম বসো। বলো কিছু কাজ ছিলো? মেয়েটি না বসে অতি সংকোচের সঙ্গে একখানা ভাঁজ করা কাগজ আমাকে দিয়ে বললো - মেশো মা তো চলে গেলেন। মেয়েটির স্বর রুদ্ধ হলো। একটু পর চোখের জল মুছে বললো আমার খুব লিখতে ইচ্ছে করতো। কিন্তু পারিনি চেষ্টা করেও। আমি পারিনা। আমি এক্ষুণি চলে যাবো আমার জেঠুর সঙ্গে, ওদের কাছেই থাকবো। আর হয়তো দেখা হবেনা আপনাদের সঙ্গে। তাই যাবার আগে একটা লিখা দিয়ে গেলাম, যদি আপনার কোনও কাজে আসে। মা মারা যাবার পর একা শুতে গিয়ে মায়ের কথাই মনে পড়ে। গত রাতে এই লিখাটি লিখেছিলাম। আপনার যদি উপযুক্ত মনে হয় আপনি ছাপাবেন। বলেই আবার টিপ টিপ করে দুজনকে প্রণাম করে কান্না ভেজা স্বরে 'আসি' বলে চলে গেলো। আমি কাগজের ভাঁজ খুলে দেখলাম কয়েক লাইনের কিছু কথা লিখা। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি অনেক আগেই খুইয়েছি, চশমা পড়া না থাকাতে লিখাটা পরে পড়বো বলে টেবিলের ঢাকনার নীচে রেখে দিয়েছিলাম। আজ এতোদিন পর ঐ কথাটি মনে পড়লো।

স্ত্রী কে বললাম সেটা কোথায় রাখা আছে তা তো মনে নেই। সেদিনই সন্ধ্যেয় শ্রীমতি কাগজ একখানা আমার দিকে বাড়িয়ে দিলেন- দেখো তো এখানা ছিলো কি? নাম টাম তো কিছুই লিখা নেই, তারিখ ও নেই। কাগজখানা নিয়ে মনে হলো -এটা সেটাই। চশমা পড়ে কাগজের উপর চোখে বুললাম।

৩১ শে, ডিসেম্বর। মা -কে হারালাম। যন্ত্রণা - বুকের ব্যাথা কাউকে বোঝানো যায়? পৃথিবীতে আর কেউ মায়ের স্থানের উপর হতে পারেনা। প্রতি মুহূর্ত, প্রতি প'ল বুঝতে পারছি। 'মা' মা বললেই কান্না এসে যায়। হ্যাঁ চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে করে। কিন্তু আমরা বড় হয়ে গেছি। আমাদের কান্না বুকের মাঝে, মাথায়, কানের পাশে, গলায়, চোখের ভেতর, চশমার আড়ালে, কখনও হয়তো বা দুচার ফোঁটা ঐ চশমার ফাঁক দিয়ে কাঁচটাকে ঘোলাটে করে দিয়ে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে গলার, কানের কপালের ব্যাথাটাকে আরও টনটনে করে দিয়ে গলগল করে- গরম জল হয়ে - বেরিয়ে আসে। কান্নার একটাই রূপ। সেটা আনন্দের হোক, দুঃখের হোক, শোকের হোক, বড়দের কী ছোটদের, গরীবের কী ধনীর -যারই হোক যে কারনেই হোক - কান্না এক বিশেষ অনুভুতিরই প্রকাশ, একটাই তার রূপ ।

আমার ছোটবেলাকার কথা ভালো মনে পড়েনা। মায়ের আদর, মায়ের শাসন সব বড় বেলাকার কথা। মায়ের মুখ ধরে কখনও আদর করেছি বলে মনে পড়েনা, মায়ের পায়ে তেল মেখে দিয়েছি বলে মনে পড়েনা। মা করে দিয়েছেন আমাকে। চোখ বুজলেই মায়ের হাতের স্পর্শ অনুভব করছি। আমি কী করি?

একটা ছোট্ট কাগজ। আমি একজন লেখক বলে সবাই জানে। আমিও ভাবি। কিন্তু এভাবে কী নিজের কোনও অনুভূতি দিয়ে কাউকে স্তব্ধ করতে পেরেছি? কেন জানিনা, ছোট্ট কাগজের লিখাটুকু আমার অন্তরাত্মাকে পুরোপুরি নাড়িয়ে দিয়ে গেলো। বসে রইলাম কাগজখানা হাতে নিয়ে।

... মনে হচ্ছে জীবনটা বড় ছোট্ট, খুবই ছোট্ট, কত কথা বলার, শোনার, কত জানাবার -কতো জানার, কত দেবার -কতো পাবার, কত দেখবার -কতো দেখার আছে। নিজেদের আয়ত্বেই আছে, কিন্তু সময়.....সময়টা যে খুবই কম। কুলোয় না সময়ের অভাবে। অনেক কিছু ছেড়ে যায়, বাদ পড়ে যায়, কী-করবো কণ্ঠ হয়। বুকের মাঝে একটা ছন্দ উঠে -সেটা কেমন বুঝাতে পারা যায় না। এটাকেই কী বলে হাহাকার? হা হা রব?

স্ত্রী এসে আমাকে ডাকলেন -কী হলো? বসে রইলে? কিছু হলো? কাগজখানা শ্রীমতির দিকে এগিয়ে দিলাম। স্ত্রী পড়ে নিয়ে বিছানায় বসে পড়লেন। বললেন - আমার মায়ের মৃত্যুর কষ্টটা আমি আবার - অনুভব করছি। বলতে বলতে চোখে জল এসে গেলো আমার শ্রীমতির, হয়তো বা আমারও, একটু পর আমার স্ত্রী ভাঙ্গা গলায় জিজ্ঞেস করলেন - তাহলে এখন কী করবে? বললাম - এই লিখাটাই দিয়ে দেবো, মেয়েটির নাম ও উল্লেখ করে দেবো। তারপর যদি কোনও সুধী বলেন অন্যের লিখাটাই তো লিখে দিলাম তাহলে আমার কিছু করার নেই, বলবো আগামী বারের জন্যে আমারটা তোলা রইলো।

ooo

আকাশ কুসুম

শিবানী দে
বাংলা বিভাগ

ঐ.... ঐ... দুজনকে হাত ধরাধরি করে যেতে দেখে মিঠুর বুকটা টনটনিয়ে উঠলো, মনের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ঐতো সেদিনও মিঠু আর রাজু হাত ধরাধরি করে নয়, তবে পাশাপাশি ঘনভাবে একসঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে পানবাজার থেকে হাটতে হাটতে ভরলুমুখে এসে গেলো। ওদের কি আজকের বন্ধুত্ব? আজকের জানাশোনা? তাও কেন যে ওদের সম্পর্ক এমন একটা বিশেষ রূপ নিল না, যার জন্য ওরা সারাজীবনের জন্যে অটুট বন্ধনে বাধা হয়ে যেতো। মিঠু আকাশপাতাল অনেক কিছুই ভাবতো, কিন্তু রাজু কি ভাবতো?

রাজু আর মিঠুর বাড়ী পাশাপাশি না হলেও কলেজে একই সঙ্গে পাঁচ বৎসর, ওদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের দুবৎসর ওরা একই অনুষ্ঠানে পড়াশুনা করেছিল তাই বন্ধুত্ব গাঢ় হয়েছে। পড়াশুনা শেষ করে দুজন দুদিকে কাজে ঢুকেছে, একজন **Multinational Company**-তে একজন **Private School**-এ। পড়াশুনার চাপ নেই, নিজেও স্বাবলম্বী, বন্ধুত্বটাও ভালই বজায় ছিল। মিঠুটা বলতো না কিছু, শুধুই আকাশকুসুম কল্পনা করতো। সে ভাবতো এই সম্পর্কের মধ্যে নিশ্চয়ই বন্ধুত্বের চেয়ে বেশী কিছু রয়েছে। কুকুর, বেড়াল বাড়ীতে পুষলেও একটা মায়া পড়ে যায় আর ওরাতো এক একটা আস্ত আস্ত মানুষ।

রাজুকে মোটামোটি সুপুরুষ বলা যায়। মিঠুর চোখে রাজুর অবগুণ গুলো ধরা পড়ে না। ওর মনে হয় ওরা **Made for each other**। তাই ও স্বপ্ন দেখে, ... রাজুকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে। কিন্তু আকারে ইঙ্গিতে প্রকাশ করলেও বুক ফাটে কিন্তু মুখ ফোটে না মিঠুর। সে ভাবে এই বন্ধুত্বের পরিণাম স্বাভাবিক ভাবেই দুজনকে একই বন্ধনে বাঁধবে। স্বপ্নের জগতে রাজুর সঙ্গে তুমি তুমি সম্বোধন করলেও সামনাসামনি তুই তোকারিই চলে। ভাবে রাজুই একদিন ওকে **propose** করবে আর মিঠুর অপেক্ষার অন্ত হবে।

অপেক্ষা একদিন শেষ হয়। রাজু মিঠুকে **Phone** করে বলল, "তোর জন্যে একটা **surprise** রয়েছে, শনিবারে নদীর ধারের **Park**-টাতে আসবি ৫ টার সময়।" নানা অজানা ভাবনায় দুটো দিন পার করলো মিঠু। ভাবলো রাজু ওর মনের কথা বুঝেছে। ওকে কোনো ভালো উপহার দেবে আর **propose** করবে। এভাবে সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে রাতে ওর অনেক দেরী করে ঘুম আসে। স্বপ্নে সে রাজুর সঙ্গে হাত

ধরাধরি করে কোন সমুদ্রের পাড়ে পাড়ি জমায়। সমুদ্রের নোনা জলের আরাম সে অনুভব করে। কিন্তু চারদিকে যেন সামুদ্রিক অক্টোপাস ছড়িয়ে রয়েছে। ওর মনে হতে লাগলো ও ভেসে যাচ্ছে। ও চিৎকার করলো ওকে জল থেকে তুলে আনার জন্য। কিন্তু ওর মুখ থেকে বীভৎস কিছু আওয়াজ মাত্র বেরোচ্ছে। ওর কথা কেউ বুঝতে পারছে না। মিঠুর দম যেন আটকে আসছে। এরপর ওর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। স্বপ্নের ঘোর কাটতে সময় লাগলেও ওর মনে পড়ল আজকেই সেই বিশেষ দিন। রাতের স্বপ্ন যাই হোক বিকেলে ও যে কথাটা জানবে সেটাতো অবশ্যই স্বপ্নাতীত হবে।

সময়মতো নির্দিষ্ট জায়গায় সে চলে আসলো। গিয়ে দেখল রাজুর সঙ্গে একটি মেয়ে ওখানে দাড়িয়ে রয়েছে। রাজু মিঠুকে দেখে এগিয়ে এলো। মেয়েটিও পিছু পিছু আসলো। রাজু পরিচয় করিয়ে দিল। **Meet Monalisa, my collegue,** আমার হনেওয়ালি... তার পরের কথাগুলো মিঠুর কানে গেলো না। কান গরম হয়ে ধোয়া বেরোচ্ছে বলে মনে হল। সে একটু হাসলো, তারপর **free** হবার চেষ্টায় কিছু আবোল তাবোল বলে বলল যে আজ ওর শরীরটা ভালো নেই, তাই ও বাড়ী যাবে। কিন্তু রাজু ওকে যেতে দিলোনা। ওরা একটা **restaurent**-এ ঢুকল, ঢুকে মনালিসার প্রিয় খাবারের **item** আর **coffee order** করল। খাবারের টেবিলে বসে মিঠু ভাবলো, কেন সে রাজুকে এভাবে ভালোবাসলো? কেন রাজুর মতো নির্মল বন্ধুত্ব সে বজায় রাখতে পারলো না? সেও কেন কোনো **boy friend** খুঁজে নিতে পারলো না, যার হাতে ধরে রাজুকে সেও বলতে পারতো **Meet Mr.....** আমার হনেওয়ালা.....।

ooo

শিক্ষক ঃ রঘু, সপ্তাহে মোট কয়দিন থাকে?
রঘু ঃ স্যার, সপ্তাহে মোট সাতদিন থাকে।
শিক্ষক ঃ একটি মুর্গী যদি সপ্তাহে একটি করে ডিম পাড়ে, তাহলে সপ্তাহে কয়টি ডিম হবে?
রঘু ঃ স্যার ছয়টি, কারণ রবিবার বন্ধ।

ooo

(এক ব্যক্তি তার ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে গিয়েছেন)
মেয়ের মা ঃ শ্বশুর বাড়ীতে আমার মেয়ে ভালো থাকুক তাই আমি চাই। সেজন্য ওর বাবা ২৫ বৎসরের মেয়ের জন্য ২৫,০০০ টাকা, আর ৩০ বৎসরের মেয়ে জন্য ৩০,০০০ টাকা যৌতুক হিসাবে রেখে দিয়েছেন।
পাত্রের পিতা ঃ (একটু ভেবে) আপনার বাড়ীতে পঞ্চাশ বৎসরের বিবাহযোগ্য মেয়ে আছে?

সংগ্রাহক ঃ অনুরাধা বসাক, স্নাতক তৃতীয় বর্ষ

২০০৫ প্রতিধ্বনি উন্মোচন

২০০৯ প্রতিধ্বনি উন্মোচন

বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীর মায়ং ভ্রমণ, ডিসেম্বর, ২০০৯
(মধ্যে মায়ং-এর রানী)

২০০৯ প্রতিধ্বনি উন্মোচন
বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপিকা ও ছাত্র-ছাত্রীরা